চতুর্থ অধ্যায়

গল্পের গঠন শৈলী ঃ ভাষা ও প্রকরণ

হার্বার্ট রিড বা মিডলটন[১] মারি যখন গদ্যের স্টাইল বিষয়ে তাঁদের বিখ্যাত বইগুলো লিখেছিলেন, তখনও গদ্যরীতি নিয়ে পুরনো প্রথাগত ধারণাই প্রবল ছিল। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে গদ্যরীতি নিয়ে ঐ পুরনো ধারায় রচিত হয়েছে বেশ কিছু বই। এসব বইয়ের রচয়িতাদের মধ্যে আছেন সজনীকান্ত দাস, শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক। তবে নিঃসন্দেহে বাংলা গদ্যরীতি বিষয়ে আলোচনা পাওয়া গেছে সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' নামের বইয়ে। এই বইয়ের আলোচনা যে সম্পূর্ণ নতুন রীতি অনুসরণ করেছে তা নয়, ১৩৪১ সালে লেখা বইটিতে ততখানি সম্ভবও ছিলনা। বরং বলা যেতে পারে এই বই পুরনো ও নতুন ধারার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে ও আমেরিকায় শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয়। ত্রংকুয়িস্ট, সেমুর চ্যাটম্যান, পল গারভিন, টমাস সেবিয়ক, স্টিভন উলম্যান[২] প্রমুখের আলোচনায় আধুনিক শৈলীবিজ্ঞান ও গদ্যরীতির নানান দিকের উন্মোচন ঘটে। বাংলা ভাষাতেও এসবের অনুসরণে নতুন ধারার আলোচনা পাওয়া যায় অপূর্বকুমার রায়, শিশিরকুমার দাশ, নবেন্দু সেন, আশিসকুমার দে[৩] প্রমুখ লেখকের কাছ থেকে। অন্যদিকে গদ্যশৈলীর তত্ত্বগত ভাবনা ও তার প্রয়োগ নিয়ে লিখলেন পবিত্র সরকার ও প্রণয় কুমার কুণ্ডু।[৪]

পশ্চিমি গবেষকদের আলোচনায় ক্রমশ গদ্যরীতি শৈলী বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত একটা বিষয় হিসেবে গড়ে উঠল। এই ধারা মোটামুটিভাবে বাঙালি লেখকরাও অনুসরণ করলেন। এঁদের আলোচনায় গদ্যরীতি বিচারের একটা দিশাও পাওয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র, তারাশঙ্কর প্রমুখ সাহিত্যিকদের গদ্যভাষা নিয়ে অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণের প্রকার পদ্ধতি অনেকটাই বিধিবদ্ধ হতে পেরেছে। এখানে বলা প্রয়োজন, কোনো সাহিত্যিকের ব্যবহৃত গদ্য নিয়ে আলোচনা আগেও হয়েছে। তবে অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই তা হয়েছে প্রথাগত সাহিত্য সমালোচনার পথ ধরে। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ধারা তার সঙ্গে মিলবার কথা নয়। ল্যাংলিট (Lang-Lit) বিতর্কের কথা আমাদের অজানা নয়।[৫] কোনো সাহিত্য-রচনার ভাষা নিয়ে সাহিত্য-সমালোচনার ধারায় যে বিশ্লেষণ হয়, তাকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা প্রায়ই গুরুত্ব দেননা। তাঁরা বলেন, কোনো রচনার শৈলী নিয়ে যে আলোচনা হবে তাতে লেখকের মানসিকতা, আবেগ প্রভৃতি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে শুধু রচনাটির অর্থাৎ Text-এর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হবে, নইলে সে আলোচনা নির্বস্তুক হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। অথচ নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণই এক্ষেত্রে কাম্য। এখানে স্মরণ করা দরকার যে পাশ্চাত্য শৈলীবিজ্ঞানের আবির্ভাব অনেকটা ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে আপোশ হিসেবে। শৈলীবিজ্ঞান সাহিত্যের ভাষার বিশ্লেষণ বটে, ভাষাতত্ত্বের প্রকরণ ব্যবহার করেই সাহিত্যের ভাষার বিশ্লেষণও বটে, তবে সাহিত্য সমালোচনার প্রকরণগুলো শৈলীবিজ্ঞান একেবারে উড়িয়ে দেয় না।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গদ্যরীতিতে কমলকুমার মজুমদার এবং অমিয়ভূষণ মজুমদারের নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। অমিয়ভূষণের সাহিত্যিক গদ্যের একটি নিজস্ব চলন আছে— বিষয় অনুসারে গদ্যরীতির পরিবর্তন ঘটে। তাঁর গল্প-উপন্যাসের ভাষা ন্যারেশান ধর্মী হলেও তিনি অন্তর্গূঢ় জীবন ও জগতের চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী, সেখানে কখনো কখনো অনৈসর্গিক ম্যাজিক রিয়ালিজম উঁকি দিয়ে যায়। ইলিউশান এবং রিয়ালিটির ঘরকন্না তার অনুশীলনের মূল বিষয়। শিল্পের অনিবার্য দাবিতে কনসিলমেন্ট, অকথন এবং জটিল ঘুর্ণাবর্তে তাই তাঁর বাচনভঙ্গী কখনো কখনো তির্যক এক ধরণের শ্লেষাত্মক বাক্যবন্ধনে আবদ্ধ করে।

আমরাও অবশ্য কোনো লেখকের ভাষা-বিশ্লেষণের সময় তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতা ও আবেগকে এড়িয়ে যাবার পক্ষপাতী নই। কেননা, যে-কোনো লেখকের মানসিকতা ও প্রবণতা তাঁর ভাষাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এটাই আমরা বিশ্বাস করি। ডেভিড লজ উপন্যাসের ভাষা প্রসঙ্গে বলেছেন, ভাষাতাত্ত্বিক আর সাহিত্য-সমালোচকের বিবাদ যতই চলুক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে উপন্যাসের ভাষা-বিশ্লেষণে সাহিত্য-সমালোচনার প্রয়োজন কখনো ফুরোবে না। আর ভাষাতত্ত্ব সাহিত্য-সমালোচনাকে কখনো উৎখাত করতে পারবে না।[৬]

বাংলা ভাষার সফল বিকাশের একটি ক্ষেত্র অমিয়ভূষণের কথাসাহিত্য। তাঁর গল্প বাংলা গদ্যের সৃষ্টিশীল ও পরীক্ষামূলক প্রয়োগকে সাহিত্যের দিক থেকে

সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। বাঙালি অমিয়ভূষণের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে এ গদ্যে। সংলাপ ও গদ্য কথনের নির্ভরে লেখক অমিয়ভূষণ যে পাঠ্যবস্তু প্রস্তুত করেছেন তার গঠন প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। বাঙালি যে ভাষা বলে তার বার্তা সামাজিক, আর অমিয়ভূষণও লেখেন সহৃদয় সামাজিকের জন্য। তাঁর বাক্যের পর বাক্যের রচনা যোগাযোগের একটি প্রক্রিয়া রূপে সম্পূর্ণ পাঠকর্মে পরিণতি পায়, এবং কথকের ও লেখকের, পাঠকের ও পাঠ্যবস্তুর, চেতনা সেই রচনায় চিত্রিত ও বিচিত্রিত হতে থাকে। শব্দ যেহেতু ভাবনা নয়, 'চেতনা', তাই তা জ্ঞান নয়, অন্তর্জ্ঞানপ্রসূত। আর যদিও ভাষাবিজ্ঞাননির্ভর সাহিত্য-সমালোচনায় 'বোধি' এক সন্দিগ্ধ পরিভাষা, তবু দেখা যাচ্ছে এর প্রয়োগ প্রতিষ্ঠিত ও অপরিহার্য। কারণ লেখকের বোধিসত্ত্ব দৃষ্টিবিন্দুর ক্রমিক প্রসারে তাঁর বিশ্ববীক্ষার প্রজ্ঞাপারমিতা।

কথনশাস্ত্রে উপাখ্যানের থেকে দৃষ্টিবিন্দু পৃথক করার প্রথা আছে। 'তাঁতী বউ' গল্পে লেখক অমিয়ভূষণ সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিবিন্দু থেকে এক ধূসর সময়ে তাঁতি গোকুল ও তার বউ-এর ভাবনা-বেদনায় যেমন অন্তরঙ্গভাবে স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ করতে পেরেছেন, সে-পথে পদচারণার সুযোগ বহিরঙ্গে লৌকিক পাঠকের নেই। আর শেষ পর্যন্ত তাঁতি বউ আবার সন্তানবতী হয়ে উঠতে পারবে কিনা এমন ভবিষ্যৎ বাণীও লোকায়ত মানস করতে অক্ষম। বিপরীতক্রমে, 'মিস্টার ফন্‌টি' গল্পে সার্কাসের বামনটির অব-মানবতা থেকে মানবতায় ফেরার যে চূড়ান্ত অনুভব সে সম্পর্কে কথক অমিয়ভূষণ ছদ্মনিস্পৃহ বা আপাত উদাসীন। আর, 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' গল্পে কথক অমিয়ভূষণ থেনডুপ ও বিশেষত পেমা চরিত্রের পটভূমি থেকে কথনের ঘটনাবলি দেখিয়েছেন, পূর্বাপর লাঞ্ছিত এক পাহাড়ি দম্পতির ঘটমান বতর্মানটি গোষ্ঠীগত — তবু ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার ওপরে সেক্ষেত্রে স্বরাঘাত পড়েছে। অবশ্য এমন নয় যে, অমিয়ভূষণের গল্পের শিখরমালায় এই তিনটি দৃষ্টিবিন্দু আছে, বরং এই ত্রয়ী অবস্থান প্রতিনিধিস্থানীয় বলা যায়। চেনা ভাষাকে অচেনার সৌজন্যে দেখানোর অধিকারী এই তিনটি দৃষ্টিবিন্দুতে শ'দেড়েক বছর আগেকার ত্যেইন কথিত প্রতিবেশ, জাতি ও মুহূর্তের চেতনায় অধিষ্ঠান ঘটালে অমিয়ভূষণ কৌতুক বোধ করবেন। প্রতিবেশপ্রসূত দৃষ্টিকোণকে দেশ-কালগত দৃষ্টিবিন্দু, ভাষা চেতনাপ্রসূত প্রাতিস্বিক দৃষ্টিকোণকে ভাবাদর্শগত দৃষ্টিবিন্দু এবং মুহূর্তপ্রসূত দৃষ্টিকোণকে মনোগত দৃষ্টিবিন্দু বলে চিহ্নিত করলে আরো যথাযথ বলা হবে হয়তো।

অমিয়ভূষণের গল্পে স্থানিক ও কালিক দৃষ্টিবিন্দুকে শনাক্ত করা সব থেকে সহজ। এই দেশকালগত প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পের সময় গতিমান থেকেছে সবসময়। তাঁর অধিকাংশ গল্পে লক্ষ্য করা যায়, সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছে ধীর লয়ে, যেন সময়ের বেড়ি বাজাতে বাজাতে বন্দী চলেছে বধ্যভূমির উপর দিয়ে, যে বধ্যভূমি সাজানো টুকরো টুকরো ঘটনার স্তম্ভ দিয়ে, এবং গল্পের শেষ দিকে দ্রুত লয়ের তেহাই বা ঝালা, শেষ পর্যন্ত বন্দী মুক্ত। 'অধ্যাপক মোহিত স্যানের উপাখ্যান'-এর শেষে লেখকের মন্তব্য ঃ 'এ জায়গায় এসে অধ্যাপক মোহিত স্যানকে হারিয়ে ফেললাম।' 'রাজীব উপাখ্যান'-এর শেষে আছে : 'রাজীব মরলে আর কার মৃতদেহ হবে সেটা; আপনি কি মনে করেন নিহত ভ্রূণটা কোনোভাবে চোখে পড়েছিল রাজীবের?' এবং 'সিগারেট কেসটা তো বুক পকেটে থাকার কথা।' তাঁর গল্পের বৈঠকি মেজাজ এভাবেই শেষ হয় ভালো গোয়েন্দা-গল্পের সুনিশ্চিত অনিশ্চিয়তায় এসে। 'নির্মল সিংঘীর অপমৃত্যু', 'একটি শিকার কাহিনী'-তে জাগুয়ারের আক্রমণে টোয়াইন্যামের মৃত্যু, 'সুশোভনার কাহিনী'-তে সুশোভনার আত্মহত্যা, 'একটি মাঝারি মানুষের গল্প'-এ জনমত পত্রিকার জন্মদিন ও তার সম্পাদক বজ্রভূষণের মৃত্যু, 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' গল্পে, থেনডুপের হত্যাকর্ম পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চায়, অমিয়ভূষণের গল্পে ঘটনাবলির অবসান মৃত্যুতে। তার কারণ মৃত্যুর পর আর কোনো ঘটনা থাকে না, সময়ই থাকে না মৃত্যুর পর, এবং তাই মৃত্যুও থাকে না। মৃত্যুর চেতনাকে খণ্ডন করবার জন্যে মৃত্যুর এ প্রান্তিক উপযোগ অমিয়ভূষণের গল্পের সময়কে সম্পন্ন করে। মৃত্যু যে ঘটেছে বা ঘটবে তা অমিয়ভূষণ পাঠককে অগ্রিম জানিয়ে দেন, যেমন 'পায়রার খোপ' গল্পে ভামের আগমন ও একটা পায়রার তিরোধানের স্বপ্ন শেষে এ পরিবারের একাধিক মৃত্যু ঘটে। অমিয়ভূণের প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য গল্প 'তাঁতী বউ'-এ ফকিরের অপমৃত্যুর ঘটনা ছাপিয়ে উঠেছিল 'তাঁতী বউ'-এর গর্ভবতী হয়ে ওঠার অবৈধ, তবু অধিকারী হওয়ার ঘটনা। তারপর থেকে তাঁর গল্পের ঘটনাচক্র হয় অন্য একটা জীবনের — যা নিষিদ্ধ তবু আকর্ষণীয় তাই জীবন্ত — এবং এই ভাবেই বৃত্তাচাপ তৈরি করে কাহিনির সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে; 'শ্রীলতার দ্বীপ' বা 'অর্পিতা সেন' গল্পের দাম্পত্য সমাজনিষিদ্ধ সম্পর্কে অন্বিত হয়েই কাহিনিকে মুক্তি দিতে পারছে, তখন সে কাহিনি হয়ে উঠছে এক মহাবিশ্ব।

অমিয়ভূষণ চিত্রকরের ভূমিকা অপছন্দ করেন না, ফলে তাঁর গল্পে দেশকালগত দৃষ্টিবিন্দু দৃশ্যশিল্পের মতোই একটি স্থির অবস্থান থেকে সময় ও সমাজকে অভিব্যক্তি দিতে চায়, বরং শব্দের সহযোগে দূরের থেকে সুদূরকে, স্বচ্ছতা থেকে অস্বচ্ছতাকেনির্দেশ করতে করতে এগিয়ে চলে, একটি স্থির দৃষ্টিবিন্দু থেকে পাঠকের জন্যে বাড়িঘর মানুষজন নদীমাঠ বনপাহাড় সমন্বিত একটি পটপ্রেক্ষিত গঠন করে এবং এই তলার মাটি খুঁজে পান। তাঁর 'উরুণ্ডী' গল্পের প্রারম্ভিক অংশে অমিয়ভূষণের ভাষা এভাবেই স্থানিক দৃষ্টিকোণ গঠনের সহায়ক হয়েছে।

এই গল্পে এগিয়ে যেতে থাকা বর্ণনামূলক অংশটি ক্রমশ বালক নিতাই, চায়ের দোকানদার গজু, মহিলা শোভা প্রমুখের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে চলেছে, তরঙ্গিত পাহাড় নাকি মেঘের বিভঙ্গের মতো লেখকের দৃশ্যমান পটপ্রেক্ষিত চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দুলছে, যেন ক্যামেরা জুম আউট এবং জুম ইন করছে, এক একবার নিতাই শোভা গজুর ভূমিকা কাছে চলে আসছে, তার মাঝে মধ্যে চিত্রিত হচ্ছে দূর, আরো দূর, আরো অনেক দূর। স্থানের আনুষ্ঠানিক বর্ণনা দিয়ে গল্প শুরু হয়েছে: 'ঠিক সমতল নয় — পথের দু'পাশে জমি কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। উত্তর বরাবর সড়কের...'। 'বরাবর', 'দুপাশে', 'ওখানেই', 'উল্টে াদিকে', 'সামনে', 'এখানেই', 'ওপরেই', 'চারিদিকে' — এরকম দৃঢ় স্পষ্ট শব্দের নির্দেশ এলাকাটিকে যেন ঘন নীল পেনসিলে এঁকে দেয়া হয়েছে।

অমিয়ভূষণের গল্পে মতাদর্শগত দৃষ্টিবিন্দুর আলোচনায় প্রবেশ করতে হয় সন্তর্পণে। কারণ, অমিয়ভূষণের রচনায় উদ্‌ঘোষিত মতাদর্শ নিন্দাজনক ও উপহাসের বিষয় এমনকি রচনায় উদ্‌ভাসিত ভাবাদর্শ, যা আলোচকের ব্যাখ্যার উপজীব্য — যেমন জগদীশ গুপ্তের গল্পে যৌনতা বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে মার্কসবাদ — জীবন ছাড়া অমিয়ভূষণের যেহেতু তেমন আর কোনো কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ে নেই, তাই তাঁর গল্পে কথিত পাঠ্যবস্তু ভাষায় যে মূল্যবোধ কাটিয়ে তোলে সেই বিশ্ববীক্ষার ধরনটিকেই তাঁর মতাদর্শ দৃষ্টিবিন্দু বলা যেতে পারে।

অমিয়ভূষণের গল্পের ভাষাগত গঠন অনেক সময় শুধু বর্ণনা বিবৃতিমূলক নয়, সংলাপ নির্ভর অথবা কথকের একোক্তি ও মনোকথনবাচক।

'গল্প' রচনাটিতে ইন্দর, ম্যাক্‌গ্লু, পিয়ের জ্যাক এবং কথক সকলে মিলে কথা রচনা করেছে। 'রীতিমতো গল্প' এর গল্প গজেন্দ্র ও মোহিতের কথকতায়। 'রাজীব উপাখ্যান'—এর গঠন সম্ভব হয়েছে মজুন্দার ও চাটুয্যের দ্বিরালাপের ফলে।

অন্যদিকে 'অধ্যাপক মোহিত স্যানের উপাখ্যান'- এ মূলত মোহিত স্যান, 'একটি মাঝারি মানুষের গল্প'- এ বজ্রভূষণ — এঁদের ভাবাদর্শের নির্ভরে লেখকের বিশ্ববীক্ষা গড়ন পেয়েছে।

অমিয়ভূষণের গল্পে ভাষাগত গঠনের নির্দিষ্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর ভাবাদর্শ প্রসূত দৃষ্টিবিন্দুর অধিকার প্রতিষ্ঠিত। তাঁর উপাখ্যানে সাধারণত লেখক-কথক বা চরিত্র ভাববাচক সহকারী; শব্দবন্ধের সহায়তায় ভাবাদর্শগত গঠন নির্মাণ করে, উক্তির বা বর্ণনার মধ্য দিয়ে বক্তার বিচার বিশ্বাসের সত্যসন্ধ উচ্চারণ দায়িত্ববান হয়ে উঠতে চায়, প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলির গ্রহণযোগ্যতা বা প্রত্যাখ্যানের উপযুক্ততাও চিহ্নিত হয় এই সব শব্দের সূত্রে। যেমন 'পায়রার খোপ' গল্পে — নীচের উদ্ধৃত অংশগুলিতে কিছু ভাববোধক সহকারী শব্দ সুনিশ্চিত বা অনিশ্চিতভাবে ভাব প্রকাশে সক্ষম। যেমন —

১. তুমি দেখো, ঠাকুরপো, আমাদের এই দাশগুপ্ত পুরস্কার পাবে।

২. কিন্তু সুবি, কিন্তু সুবি, আমার ছবি, আমার ছবি কি কোনো সাংবাদিক ছাপবে না?

উদ্ধৃত অংশে 'কিন্তু' শব্দের পুনরাবৃত্ত ব্যবহার লক্ষ করার বিষয়।

উৎপ্রেক্ষা দিয়ে প্রতীতিকে বাচ্য বা প্রতীয়মান করে তোলার একটি পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে দেখা যায় —

১. সে যে ঘরেই নেই। বহুদূর থেকে যেন বউদি সুলতার গলা ভেসে এল।

২. সুলতা যেন হাসল। কিন্তু হঠাৎ যে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সুনিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তার জ্ঞাপন ঘটছে শরীরী ভাষায় —

১. রিমঝিম করছে সুবির শরীর।

২. সুবি কথা বলতে গিয়ে ঢোক গিলল।

জ্ঞানাত্মক ও মূল্যায়ন জ্ঞাপক ক্রিয়ার সাহায্যেও এই নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তার ভাব পরিস্ফুট —

১. শোকে মুহ্যমান বোঝা যায়।

২. এমনকি মুখ দেখে মনে হয় শোকে হাহাকার করছে।

৩. সুবি ভাবলে, আজও সে কি জনক মুচির পাশে সেই ইটটার উপরে চুপ করে বসে সারাটা হলুদ আলোর দুপুর কাটিয়ে দিতে পারবে? বলো, পারবে? হয়তো বাতাসে উড়ে আসা একটা খড়ও পেতে পারে আবার আজ সময় কাটাতে।

'বলো পারবে?' এই জিজ্ঞাসা সুবি নিজেকে করেছে। এবং এ প্রশ্ন পাঠকের প্রতি লেখকেরও প্রশ্ন। একদিকে সংবাদটির মধ্যেকার সরাসরি এবং যান্ত্রিকতাই সুনিশ্চিত দৃষ্টিবিন্দু, আর অন্যদিকে গল্পটির জীবন ঘনিষ্ঠ অনিশ্চয়তার টানাপোড়েন যেভাবে গল্পটিকে বয়ন করেছে তার ছাপ এভাবেই ভাষায় মুদ্রিত।

ভাবাদর্শগত দৃষ্টিবিন্দু নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সঙ্কুল সমস্যা তা মনোগত দৃষ্টিবিন্দু নির্মাণের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। অমিয়ভূষণের গল্পের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ লেখকের প্রাতিস্বিক রচনা, না তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের নিজস্ব নির্মাণ, এবং এখানে লেখক ও তাঁর চরিত্রটির সম্পর্কের নিরিখই বা কি, এই জাতীয় প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে অনিবার্য। মনোগত দৃষ্টিবিন্দুর ব্যবহার ঘটতে পারে গল্পের বহিরঙ্গে, গল্পকার যেন এক শিক্ষিত ঝরোখা থেকে তখন কাহিনির কাঠামোর মধ্যে ঘটমান সক্রিয়তাগুলি কার্যকারণ সম্বন্ধে অন্বিত করে দেখানোর জন্য মনোগত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, কিংবা মনোগত দৃষ্টিভঙ্গি চরিত্রের মনোকথন নির্ভর করেই কথনবৃত্তটিকে সম্পূর্ণতা দিতে চায়। রূপদক্ষ ও জীবনতন্ময় গল্পকার অমিয়ভূষণের গল্পে যেহেতু অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুটি ধারাতেই মনোবীক্ষণ চলে, তাই তাঁর গল্পে মনোগত দৃষ্টিভঙ্গিকে ভাষাগত পরিস্থিতির মধ্যে শনাক্ত করার কাজটি তুলনায় শক্ত। তাঁর অনেক গল্পে মজুন্দার বা আমি — নামের সর্বনামটি আছে বটে, কিন্তু তা আছে পাঠকের প্রতি তাঁর বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ রূপেই; তাঁর গল্প আত্মকথন নয়, প্রাত্যহিক জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার রোজনামচা লেখার জন্য তিনি মনোগত দৃষ্টিবিন্দুর আশ্রয় নেন না।

'শ্রীলতার দ্বীপ' গল্পে শ্রীলতার মনোগত দৃষ্টিবিন্দু অথবা 'অসমাপ্ত' গল্পে প্রতিমা ও অশেষের মনোগত দৃষ্টিবিন্দু উপাখ্যানের নির্মাণ ও সৃষ্টি সম্ভবপর করেছে। এসব গল্পে লেখকের মনোগত দৃষ্টিবিন্দুর অবস্থান তাই প্রত্যক্ষগোচর নয়। প্রতিমা বান্ধবীকে চিঠি লেখে, অশেষ বন্ধুকে চিঠি দেয় — সেই সব চিঠির মধ্যে, অশেষের ডায়রি ও গল্পের মধ্যে, সেই মনোগত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না। 'অসমাপ্ত' গল্প থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধার করে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারব কীভাবে প্রতিমার বিশিষ্ট মনোগত দৃষ্টিবিন্দু ভাষার বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর ক'রে অস্তিত্ববান হয়ে উঠেছে। যেখানে প্রতিমার মনোগত দৃষ্টিবিন্দুর গঠন সম্ভবপর হয়েছে

প্রাথমিকভাবে তার মানসিকতা-সূচক শব্দগুলির উপর নির্ভর ক'রে। যেমন ঃ—

১. প্রতিমা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

২. ওর মনের একটা প্রবৃত্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

৩. প্রতিমা ভাবল এই সব ছাইপাশ চিন্তার মূলে —

৪. ... ওর কথা মনে হয়ে গেল।

৫. এক মুহূর্তের জন্য প্রতিমার মন যেন সেই নীতিভ্রষ্টতাকে লালন করল।

৬. যেন তার পাশে বসে তার অন্তরের গভীরতম কথাগুলি শোনা।

জানা-ভাবা সূচক ক্রিয়াপদগুলোও এই মনোগত দৃষ্টিবিন্দু প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। সতর্কতা — অসতর্কতা বোধক শব্দও এই ভঙ্গিগঠনে কাজে লাগে ঃ—

১. তোমার হাত দুটো কখন কি করে তা কি তুমি জানতে পারো না?

২. আর তুমি এসব ভাবছই বা কেন?

৩. ... তোমার তো বেশি হুঁশিয়ার হওয়ার কথা!

৪. ... চমকে ফিরে চাইল!

এই উদ্ধৃতিগুলিতে জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়সূচক বাক্যের আধিক্য চোখে পড়ে।

যৌগিক ক্রিয়াপদকে সহায়তায় চরিত্রেরা ছদ্মসক্রিয় বা আপাতসক্রিয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিষ্ক্রিয় বা শূন্য মানসিকতার ছবি ফুটে উঠতে থাকে ঃ—

১. জলে হাত ভিজিয়ে কানের পিছনে ঘাড়ে বার কয়েক বুলিয়ে দিয়ে প্রতিমা বিছানায় গিলে বসল।

২. প্রতিমা বিছানায় শুয়ে হাত বাড়িয়ে মাথার দিকের জানালার পর্দাটাকে একটু সরিয়ে দিলো।

একাকী বা নির্জন মানুষের পরিস্থিতিকে তীব্র তীক্ষ্ণ রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গত সংবেদনের নানান ভূমিকা গৃহীত হয় ঃ—

১. মনের মধ্যে রেবার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ফিরে চাইল।

২. নিচের উঠোনটা চোখে পড়ে।

৩. কানের পাশটায় গরম হয়ে উঠেছে।

৪. শরীরটা যেন স্নিগ্ধ হল।

৫. কুটরাজ গাছ থেকে এলামেলো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।

আধুনিক গল্পের এসব চরিত্র দ্বিখণ্ডিত সত্তা। একটি মন বেরিয়ে পড়তে চাইছে, আরেকটি অনপূরক এবং পরিপূরক মনের খোঁজে। এ গল্পে প্রতিমা 'মনের মধ্যে রেবার কণ্ঠস্বর' শুনেছে। সে আসলে তার নিজেরই কণ্ঠস্বর শুনতে চাইছে। দ্বিখণ্ডিত প্রতিমা নিজেকেই বলছে ঃ 'আ-ছি-ছি, প্রতিমা'। 'তুমি' ক'রে বলছে সে নিজেকে। তুই-এর নৈকট্য বা আপনি-র দূরত্ব সে চায় না। অশেষকে সে মনে মনে পেতে চায় শ্রোতারূপে, প্রত্যুত্তর দাতা রূপে। তাই তার জিজ্ঞাসা, তাই তার নিজেকে 'তুমি' বলে সম্বোধন। অন্যদিকে, অশেষও গল্পের ডায়রিতে দ্বিতীয় অশেষকে গড়ে তুলতে চায়, 'গল্পের নায়কগুলো যেন ওর নিজের ছাঁচে গড়া'।

প্রতিমা অশেষের লেখা পড়েছে, কিন্তু সে অশেষের কথা শুনতে চায়। প্রতিমার তলশায়ী মন যে সব শব্দ দিয়ে জীবন ও জগৎকে দেখে তা তার ভাব ও ভাবনা দিয়ে তৈরি। 'চাঁদ আকাশে ঢলে পড়েছে'। 'ঢলে' ক্রিয়াপদটি সুস্থিত প্রতিমাকে ঢলায়নি - রূপে তৈরি করেছে। 'চাঁদ আকাশে ঢলে পড়েছে' — তার ঐ উচ্চারণের অপর প্রান্তে আছে অশেষ, যার গল্পের 'সবই যেন রাহুগ্রস্ত'-এর পুরোনো ঘটনায়। সেই অনুষঙ্গে মনে পড়েছে 'দগদগে ফুলগুলি'র বিষয়, যা গোপন ক্ষতের মতো, কিন্তু তা বিকশিত হতে চাইছে। তাই 'বাইরে কুটরাজ গাছ থেকে এলোমেলো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।' অশেষের স্মৃতির ঘ্রাণ বিবশ করছে উন্মন প্রতিমাকে। কিন্তু, 'প্রতিমা ভাবল এই সব ছাইপাশ চিন্তার মূলে —'। গাছ এবং ফুলের সূত্রেই এই মূল গ্রন্থির। ক্ষয়িষ্ণু স্বভাবের অশেষ আর চাঁদের ঢলে পড়া দুই-ই কোথায় যেন মেলে। অশেষের 'ঘরে এতো বড়ো আলো; কিন্তু অশেষ হয়ত ঘুমোচ্ছে।' প্রতিমার দরজা খোলা রেখেছিল, সে এখনো অন্ধকারে জেগে আছে। এই অংশে বারবার এসে পড়েছে 'ছায়া' শব্দটি, সে রাহুর ছায়া, ক্ষয়িষ্ণুতার ছায়া, ছায়া পড়েছে প্রতিমার মনে। 'লম্বা লম্বা টানা টানা ছায়া' তার কাছে গরাদের ছায়া, তা গারদের ছায়াও বটে। প্রতিমা যে নিজের মধ্যে নিজে বদ্ধ এবং যে বদ্ধতা থেকে বেরোতে চাইছে, এই মনোগত দৃষ্টিবিন্দু থেকেই প্রতিমা চরিত্র বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

শিল্পকর্মে ইমেজ বা প্রতিমা হচ্ছে চিত্রের বা ভাবের রূপকল্প সৃষ্টি, মূর্ত রূপের মধ্যদিয়ে বিমূর্ত অনুভবে পৌঁছবার উপায়। অভিধানের সংজ্ঞা অনুসারে ইমেজ হল —

'to create a representation of....'

'to bring up vividly before the imagination.'

'কল্পিত বা গঠিত মূর্তি বা প্রতিমূর্তি।'

সাহিত্যে তা বাক্ প্রতিমা, চিত্রকলায় চিত্রপ্রতিমা, চলচ্চিত্রে দৃশ্য প্রতিমা।

সাহিত্যে বাক্য যখন আর নিছক বাক্য না থেকে হয়ে ওঠে চিত্র বা ভাব, পাঠকের সামনে তুলে ধরে এক একটি ভাবের বা চিত্রের রূপকল্প, তখন তাকে বলা হয় বাক্প্রতিমা। সাহিত্যের বা কাব্যের প্রাণ এই প্রতিমা প্রয়োগে। অব্যক্ত ব্যক্ত হবে, মূর্ত বিমূর্ত রূপ পাবে। প্রতিটি সার্থক বাক্ প্রতিমা সুর ছন্দের, ভাব ও রূপের মিলনে সংহত, কবি বা লেখকের সৃজনীশক্তির উদ্ভাসে সমুজ্জ্বল। বাক্ প্রতিমার থাকা চাই যথার্থতা, সুষ্ঠুতা, সংযম ও রসানুভূতি সৃষ্টির ক্ষমতা। প্রতিটি প্রতিমা যেন পরম কল্পনায় পৌঁছবার প্রকৃত পথ।

সাহিত্যিকপ্রতিমা অমলেন্দু বসুর প্রতিশব্দে বাক্প্রতিমা, জ্যোতি ভট্টাচার্য্যের চিত্রকল্প। জ্যোতি ভট্টাচার্য্য চিত্রকল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন এইভাবে যে, কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা যে কল্পনাশ্রয়ী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সূচিত হয়ে রূপ বর্ণ শব্দ গন্ধ স্পর্শ ও স্বাদ প্রভৃতি নানা সংবেদনের একটির বা একাধিকের স্মৃতি বহন করে এবং উদ্‌বোধ জাগায় সেই বস্তু চিত্রকল্প। চিত্রকল্পে চিত্রের আভাস থাকে। চিত্র সাধারণত দৃষ্টিগ্রাহ্য। কিন্তু, এই সংজ্ঞায় 'চিত্র' শব্দটির অর্থ ব্যাপক — চিত্রকল্প দৃষ্টিগ্রাহ্য তো হতেই পারে, তাছাড়া শ্রবণগ্রাহ্য, স্পর্শগ্রাহ্য, ঘ্রাণগ্রাহ্য সবই হতে পারে, এবং যেসব সংবেদন আপন শরীরের অভ্যন্তরে প্রখর অস্মিতা বোধ জাগায়, সেরকম সংবেদন ও চিত্রকল্পের বস্তু হতে পারে।

আর অমলেন্দু বসুর মতে, সৎ কাব্যের ভাষা অনিবার্য রকমে ব্যঞ্জনাধর্মী। সৎ কবির প্রয়োগে কথাগুলি তাদের ব্যবহারজীর্ণ আভিধানিক অর্থের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল ও গভীর দ্যোতনায় সমৃদ্ধ হয়, আর অর্থের সংবেদনশীল পাঠকমাত্রেই জানেন যে, সার্থক কাব্যের ভাষায় এই ব্যঞ্জনাশক্তি সচরাচর কোনো না কোনো ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতার রূপ পরিগ্রহ করে। কবিচিত্ত সহজেই Sensous, ইন্দ্রিয়বেদী। কবির আবেগ ও চিন্তা সমূর্ত হয় ধ্বনি-স্পর্শ-ঘ্রাণ-দৃশ্যের আবেদনে। এই উপমা, রূপক প্রভৃতি পোয়েটিক ইমেজ-ই বাক্প্রতিমা।

অমিয়ভূষণের প্রতিমা কখনো কখনো এক লহমায় সটান উঠে দাঁড়ায় — সংহত ও তৎপর —

(১) আকাশ থেকে দেখলে মনে হয় বিস্তীর্ণ সবুজ সাগরে একটা বিচ্ছিন্ন ছোট দ্বীপ। (মহিষকুড়া গ্রাম)

(২) ছোটো ছোটো পাক, ছোটো দু-চারটে ঢেউ, অন্য কোথাও সাপের পিঠের মতো নিঃশব্দে পিছলে যাওয়া। (নদী স্রোতের কৌতুক)

(৩) বন্যা নেমে গেলে হয়তো বোঝা যাবে, পদ্মা এবার পাশ ফিরলো কিনা — এটা তার প্রসাদ কিংবা রোষ।

প্রতিমাগুচ্ছের সুনিপুণ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই ঘটনা এখানে রূপ পাচ্ছে। বলা বাহুল্য, প্রতিমাগুলির কোনোটিতে রূপের ছবি, কোনেটিতে ভাব বা অনুভবের ছবি, কোথাও রসের ছবি আবার কখনো কোনো Concept বা প্রতীতিও অর্জিত হতে পারে — যাকে বলা যায়, মননের চিত্রণ।

একটা নির্দিষ্ট প্রতীতিকে চিত্রিত করতে প্রাসঙ্গিক প্রতিমাগুলিকে ফলপ্রদভাবে সাজাচ্ছেন লেখক। এ হল মননের চিত্রণ। প্রতিমায়ন এখানে ভাব থেকে ভাষা, ও ভাষা থেকে বোধে। বিমূর্ত থেকে মূর্ত হয়ে ফের বিমূর্ত। ফলে প্রতিমা প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিমায়নের কথা আসে, ইমেজ প্রসঙ্গে ইমেজারির কথা — 'the art of making images', প্রতিমামালা সৃষ্টির পদ্ধতি।

প্রতিমা গঠনের সময় কবি বা শিল্পী সাধারণত বেশিরভাগ সময়েই কথা বলেন অস্তিত্বের একাংশ নিয়ে। কিন্তু কখনো অস্তিত্বের সর্বাঙ্গ দিয়েও বলা হয়ে থাকে। যেভাবেই বলা হোক, অমিয়ভূষণের প্রতিমা, সূক্ষ্ম সমৃদ্ধ ও ইঙ্গিতবহ বাক্ প্রতিমায়, প্রতিমা গঠনের বহু নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ মিলবে।

প্রতিমার ইতিহাস থেকে আমরা জানি, সাহিত্যে ইমেজ আইকন হতে পারে, বাক্‌প্রতিমা, হতে পারে, মানসপ্রতিমা বা মেন্টাল ইমেজ হতে পারে। সাহিত্যে ভাব ও ভাষাগত প্রতিমা ঐ প্রতিমার অবজেকটিভ বিচার শিল্পগত অনুভূতিমূলক রূপকল্পনা। এই প্রেক্ষিতে যে কোনো সাহিত্যিক প্রতিমাকে অন্তত তিনভাবে ব্যবহার করা যায় —

১. তা কোনোকিছুর প্রতিভূ হতে পারে। — থিম বা ভাবস্তু।

২. তা কোনো কিছু সাধন করতে পারে। — মোটিভ।

৩. তা কোনো ভাবার্থ বা ব্যঞ্জনা নির্দেশ করতে পারে। — সিম্বল বা প্রতীক।

অমিয়ভূষণের ভাষায়, ভাষা নির্ভর করে ইমেজের উপর। প্রত্যেকটা শব্দ হল ইমেজ। এটি ছাড়া কল্পনা হয় না। ইমেজ কিসে তৈরি হয়? আবাল্য আমি যা দেখছি, এই কুচবিহারের ইমেজটা আমার কাছে স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট হচ্ছে। এদিকে পদ্মার ইমেজ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। এখানকার নদীগুলো যেমন ছোট, শীর্ণ, তেজস্বিনী — পদ্মার মতো নয়। এখানে চোরাবালি আছে কিন্তু ভেঙে গুঁড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তেমনি হিন্দী... যে বিহারে মানুষ হয়েছে গঙ্গার থেকে দূরে সরে গিয়ে ওয়েস্টার্ন বিহার বা সাদর্ন সাঁওতাল পরগণায় — তার ভাষার মধ্যে পাহাড় আসবে, ঝর্ণা আসবে, কিন্তু গঙ্গা আসবে না। ভাষাটাই যে এভাবে তৈরি। Atmosphere ও Culture - তো আছে। তার উপরই তো ইমেজ। ঐ যে রং, লাল বললে তোমার যা মনে হয়, Red বললে কি তা মনে হয়? একই ভাষা থেকে বলি — 'পাথর' ও 'প্রস্তর' — দুটো কি এক জিনিস হ'ল? মানে তো এক। কিন্তু যেখানে সাহিত্যের মধ্যে 'পাথর' বলা হচ্ছে, আবার 'প্রস্তর' বলা হচ্ছে, দুটো এক? চোখ তো চোখই, কিন্তু যখন 'নয়ন' বলা হয়, তখন কি মনে হয়? এই যদি একই ভাষাতে হয়, তাহলে আরেক ভাষাতে সেটা কী দাঁড়াবে? যেমন অন্ধ্রপ্রদেশে বলে, 'তামরসাক্ষ', আমরা বাংলায় বলি, 'পদ্মপলাশ-নেত্র' — মানে একই। আমাদের দেশীয় একমাত্র মাইকেল-ই 'তামরস' শব্দটা ব্যবহার করেছেন, এছাড়া কেউ করেন নি। আমাদের মনে কি তা আসবে? আসবে না। কিন্তু 'পদ্মপলাশ' বললে সঠিক ছবিটা আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

ফলে ইমেজ-ই আসল। আর ইমেজ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় যেতে পারে না। কেননা ভাষা নির্ভর করে ইমেজ-এর উপর। আর সাহিত্য রচিত হয় ভাষা দিয়ে, প্লট দিয়ে নয়। অর্থাৎ সাহিত্য নির্ভর করে ইমেজের ওপর।

অমিয়ভূষণ যা কমিউনিকেট করতে চান, তা বক্ষ্যমান গল্পের ঐ ভাষা ছাড়া সম্ভব হত না। 'রীতিমতো গল্প' শুরু হচ্ছে এইভাবে — 'গজেন্দ্র পুততুণ্ড আমাকে এই গল্পটা বলেছিল' — এই সংক্ষিপ্ত বাক্য একটি অনুচ্ছেদ। এর পরের অনুচ্ছেদে দেওয়া হল তার বাহ্যিক রূপ সজ্জার বর্ণনা — যার কাছে থেকে যার থেকে গল্পটি পাওয়া গিয়েছিল তার বর্ণনা। তাঁর গল্প তাঁর নিজস্ব সচেতনতার প্রতিমূর্তি —

চরিত্র ও প্লট -পরিস্থিতির অন্বয় সংযোগে সে প্রতিমূর্তির উপাদান এবং তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

তাঁর এক-এক গল্পের জীবনস্বাদ এক-এক রকম। কিন্তু সব গল্পেই দেখা যাবে, বাইরে থেকে লেখক— অনেক ক্ষেত্রে কথক গল্পটি ভাঙতে ভাঙতে এগোচ্ছেন, ভিতর থেকে আরও ঘন একটি গল্প গড়ে তুলবেন বলে। তাঁর ভাষা, তার ভঙ্গি কোনো সময়ে সামনে এগিয়ে আসে না — বলে না 'আমায় দেখ'। 'নির্মল সিংঘীর অপমৃত্যু' গল্পটি বইয়ের পাতায় যখন শেষ হয়, বইটি মুড়ে রাখার পর গল্পটি তখন পাঠকের মনে নতুন আলোর শুরু হয় — পাঠককে তা জড়িয়ে নেয়। এ আঙ্গিক রীতির গল্প নয়। এ হল তাঁর গল্প রীতি।

'দুলারহিনদের উপকথা'-র দুলারহিন তার ভুখন ভাইয়ের জন্য কেঁদে কেঁদে শেষমেষ শেকড় ছড়িয়ে দেয়, বীজ খসিয়ে দেয় এক ভিন গাঁয়ে; — 'তিন চারিটি ছেলেমেয়ে তার। তারা সবাই তার দেহকে এবং অধিকাংশ মনকে নিজেদের দৃঢ়বদ্ধ করে নিয়েছে। এখন বড়জোর মনের একটা উন্মুক্ত অংশ তার ছোটবেলাকার গাঁয়ের দিকে বাতাসে আগ্রহের পল্লব মেলে ডাকতে পারে।' দুলারহিনের স্মৃতি-সত্তার শৈথিল্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের হঠাৎ আবার পড়তে ইচ্ছে করবে সন্ধ্যার বাদামি আলোয়, ঝোপে ভরা মাঠে, তাদের অনির্বচনীয় ক্রীড়া-কৌতুকের দৃশ্যটি; একেবারে গদ্যের সীমানা মুছে দিয়ে যা উড়াল নেয় কবিতার স্কাইলাইনে; অংশটুকু সাজিয়ে দিচ্ছি একটু স্বাধীনতা নিয়ে ঃ—

... একবার দুলারহিনকে সে দু'হাতে চেপে ধরেছিলো
বুকের উপরে, কিন্তু হাতের ফাঁকে গলিয়ে দুলারহিন
আবার লুকিয়ে পড়লো। খেলার উত্তেজনায়
ভুখনও ছুটতে শুরু করলো।
কি এক রকমের ঘাস পায়ের তলায় দলে দলে যাচ্ছে,
একটা সুঘ্রাণ উঠছে। কি একটা উত্তাপ হচ্ছে
সেই শুকনো খটখটে ঘাসের
বাদামি আলোর পৃথিবী থেকে।

বড় লেখকের একটা বড়ত্ব এই যে, তাঁরা সামান্য মাত্র অভিজ্ঞতাকে, নিভৃতচর্চিত কল্পনা প্রতিভার ছোঁয়ায় একটা অবয়ব, একটা অখণ্ড আর সম্পূর্ণ অবয়ব দিতে পারেন। সেই অবয়ব যেন বা বহুকোণ থেকে দেখলে বহু মাত্রার

আলো ছড়িয়ে দেবে। বহুকৌণিকতা, বহুস্তরতা আর অমিয়ভূষণ যাকে বলে ভিশন অর্থাৎ জীবনানন্দ প্রস্তাবিত সেই কল্পনা প্রতিভার যথাযথ সম্মিলনে জায়মান 'দুলারহিনদের উপকথা', 'অ্যাভলনের সরাই', বা 'সাদা মাকড়সা'-র মতো 'তাঁতী বউ' গল্পটিও তাঁর আরেকটি সেরা গল্প। ইতিহাসকে এখানে তিনি আবছা একটা আবহের মতো ব্যবহার করলেও, এ-গল্পের মধ্যে কোনো ঐতিহাসিক সময়ের বাঁধা খাত নেই। পশ্চিমী ইতিহাস বিচারের, আলো-অন্ধকারের যুগ বিভাজনের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে 'তাঁতী বউ' গল্পের সময়কে বলা হয়েছে 'আকাঙ্ক্ষাহীন মিলনের যুগ।' মসলিন শিল্পী গোকুল আর ইদিলশাহী পরগণার হাট থেকে কেনা বাঁদির গল্পে, অমিয়ভূষণের অন্বেষণ বা অন্বেষণহীনতা কথকতার সহজ মধ্যযুগীয় চালে এগোয়। অন্যান্য গল্পের মতো দীর্ঘ বাক্য, জটিল অন্বয় বা ইমেজারির অনন্যতা নয়; এখানে তিনি আশ্চর্য যাদুতে ছোট ছোট বাক্যে, ইমেজারিহীনতা দিয়েও বুনে নিয়েছেন মসলিন প্রতিম স্বচ্ছ আর সূক্ষ্ম আখ্যান।

(ক) "আমার প্রত্যেকটি গল্প আলাদা, যার ভাষা পর্যন্ত।"[৭]

(খ) " Form এবং Content -এর কোন সমস্যা আমার কাছে নেই। কারণ দুটো একসঙ্গে আমার কাছে আসে। ইভ যখন এসেছিল তখন কি গায়ের ত্বক আলাদা করা হয়েছিল সে কিরকম তা বোঝার জন্যে? গল্প যখন আসে সেই ইভের মতনই আসে। তার গায়ের চামড়া অর্থাৎ আঙ্গিক তা থেকে আলাদা করা যায় না।"[৮]

(গ) "গল্প-উপন্যাস একটা জিনিস, ধ্যান করতে করতে একটা মূর্তি সামনে দেখা যায়।"[৯]

তার মানে, অমিয়ভূষণের গল্প বয়নের যে বৈচিত্র্য, তিনি বলতে চান সেজন্য তাঁকে কখনো আলাদা করে ভাবতে হয়নি। অনেকটা, ভারতীয় যোগী প্রবরদের মতো তিনি ধ্যানের মধ্যেই পেয়ে যান গল্পের মূর্তি। তার প্রাণ, তার দেহডৌল। কিন্তু উনি বলেছেন, 'একটা জিনিস' এবং তার 'ধ্যান করতে করতে' — অর্থাৎ ধ্যানটুকু সচেতন এবং আয়াসসাধ্য। আর 'মূর্তি'টা হঠাৎই দেখা দেয়। বিষয়টি আরেকটু স্পষ্ট করে বুঝে নেবার জন্য তাঁর কথাই উদ্ধৃত করা যাক ঃ—

"... কখনও একখণ্ড পাথর দেখেই খুব পছন্দ হয়ে যায় (একটা জিনিস) তার texture, fibre, grain, colour, glint এসব দেখতে থাকা ভাস্করের অবচেত

ন মনের থেকে form ফুটে উঠতে থাকে পাথরটার গায়ে, (ধ্যান > মূর্তি) ছেনি হাতুড়ি হাতে নেওয়ার আগেই (লিখন প্রক্রিয়ার প্রাক্‌মুহূর্ত ?)। ... দেখা যাচ্ছে পাথর আর ফর্ম (থিম + ফর্ম) যেন পরস্পরকে আকর্ষণ করে।''[১০]

মূর্তি ফুটে উঠলে 'লিখতে আর কতক্ষণ!' আলোচনার এই পর্যন্ত পড়ে মনে হতে পারে — সবটাই সৃষ্টি, নির্মাণ কোথাও তেমন গুরুত্ব পাচ্ছেনা। কিন্তু অমিয়ভূষণ সে ব্যাপারেও জানিয়েছেন যে, তিনি শব্দ ব্যবহারে খুঁতখুঁতে, শব্দ পাল্ট াতে হয় তাঁকেও — 'একবার কেন তিন চারবার'। শুধু শব্দ? তিন চারদিন ধরে লেখা 'তাঁতী বউ' গল্পের বেলায় কি শুধু কিছু শব্দ নাকি একাধিকবার খসড়াও বদলাতে হয়েছিল? জানা নেই। অন্তত, 'সাদা মাকড়সা' বা 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া'-র মতো বিরাট ক্যানভাসে ফোটানো জটিল আর গল্পগুলির সৃজন - ইতিহাস জানতে খুব ইচ্ছে করে; যদিও শেষ অবধি পাঠ ও অনুভবের অদ্বৈতে তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। তিনি, তাঁর প্রিয় লেখকদের তালিকায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, স্তাঁদাল ও টমাস মানের নাম করেছেন। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই নির্মাণ ব্যাপারে এমনই অতৃপ্ত শিল্পী যে, বার বার কেটে কুটে, খসড়া বদল করে, বাতিল করে প্রথম সৃজন মুহূর্তের স্বল্প কিছু সম্পদ মাত্র অনেক সময় শেষ অবধি বেড়াতে গেলে অনিবার্যভাবে বর্হেস ও মার্কেজের কথাও মনে পড়ে যায়; তাঁরাও জানান গল্প রচনা ও গড়ে তোলার দীর্ঘ অতৃপ্তিকর প্রক্রিয়ার কথা। অমিয়ভূষণ ব্যতিক্রম; লেখা তাঁর কাছে আনন্দের ব্যাপার এবং শিলা ও শৈলীর দ্বন্দ্ব তাঁকে বিচলিত করে না। কিন্তু একজন লেখক যখন তাঁর মূর্তি তৈরির জন্য শিলাখণ্ড পছন্দ করে নেন, সেই নির্বাচন থেকে অন্তত আন্দাজ করা যায় তাঁর মেজাজ - মর্জির অভিমুখ্য।

এইখানে এসে মনে হয়, অমিয়ভূষণ ছোট ছোট রেখাচিত্র আঁকতে পছন্দ করেন না, টুকরো কাঠকুটো দিয়ে বাসা তৈরি তাঁর ধাতে সয় না; তিনি কাজ করেন বড় ক্যানভাসে, তাঁর লাগে অনেক রং, নানা সাইজের তুলি আর দীর্ঘ সময় পরিধি। বড় এক পাথরের চাঁই নিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চালে তাঁর সৃজন প্রক্রিয়া উপলব্ধি করা যায়।

শৈলী বিজ্ঞানের নানা বিভাগকে স্পর্শ করেছে তাঁর শিল্পপ্রকরণ। উত্তর আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত বাংলা সাহিত্যের বিরলতম আধুনিকতাকে প্রকাশ করে। মাতদর্শগত দিক থেকে তাঁর এমন কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে, যা অনেকের কাছেই গ্রহনযোগ্য হয় না। জোলো আবেগ ও চোখের জলে ভেসে যাওয়া একালের বাংলা

কথাসাহিত্যকে তিনি ঋজু, নির্মোহ গদ্যের শক্ত জাঙাল দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তাঁর অনেক উপন্যাস-ছোটগল্পের চরিত্রই প্রবৃত্তির চকিত উদ্ভাসে 'লিবিডো'র প্রহারে সর্বস্ব হারিয়ে আত্মঘাতী হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে অস্বীকার করে আর্থ সামাজিক অবস্থা, আন্তর্জাতিকতা ও স্বদেশিকতার বিচার তাঁকে যে পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে তিনি সে পথেই তার সৃজন ও নির্মাণ প্রক্রিয়াকে অটুট রেখেছেন।

অমিয়ভূষণের গদ্য ভাষায় দুটো স্তর দেখতে পাওয়া যায়। উপরিস্তরে আছে আপাতবোধ্য একটা ভাষা, যেখানে শব্দের ব্যবহারে কোনো চাতুর্য নেই। পাঠকের মনে হবে লেখকের বক্তব্য বেশ বোঝা গেল। কিন্তু তাঁর ভাষার একটা অন্তঃস্তরও আছে, আর সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে শব্দগত দুরুহতা না থাকলেও অর্থগত বা ব্যঞ্জনাগত দুরুহতা যথেষ্টই আছে, আছে নানা কূটাভাষ। যিনি বলেন 'স্বপ্নের কাছে আমি কৃতজ্ঞ', যিনি বলেন সাহিত্য দিবাস্বপ্নের মতো, তাঁর গদ্যভাষার আপাতবোধ্যতা নিঃসন্দেহে একটা ছদ্মবেশ। তিনি লিখেছেন — "আমাকে একাধিক সম্পাদক সরল বাক্যে লিখতে অনুরোধ করেছেন।"[১১] অমিয়ভূষণের বাক্য অসরল বা জটিল নয়। তবে বাক্যের সরলার্থের নীচে যে গূঢ় অর্থ তাতে জটিলতা কম নয়। তাঁর ভাষার আঁচ পেতে হলে বুঝে নেওয়া দরকার সেই চেতন-অবচেতনের টানাপোড়েনকে যাকে তিনি তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে বিশেষভাবে রূপায়িত করেছেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. The problem of style, Murry, Middleton J. 1961, and

English Prose Style, Read Herbert, 1963.

২. Linguistics and style, Enkvist, N.E. et. al. 1964;

Literary style : a Symposium, Chatman, Seymour, 1971;

Literary Structure and style, a prague school Reader on Estheties, 1964;

Style in language, Sebeok, Thomas, 1960;

Language and style, Ullmann, Stephan, 1964.

৩. উনিশ শতকের বাংলাগদ্য সাহিত্য: ইংরেজী প্রভাব, অপূর্বকুমার রায়, ১৯৭৬, এবং

বাংলা গদ্যাচর্চা : বিদ্যাসাগর গোষ্ঠী, ১৯৮২;

Early Bengali Prose, Sisir Kumar Das, 1966;

গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭১ এবং

বাংলাগদ্য স্ট্যালিস্টিকস্, নবেন্দু সেন, ১৯৮৫;

উপন্যাসের শৈলী, আশিস কুমার দে, ১৯৮৬।

৪. বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা ঃ 'রীতি থেকে রীতি বিজ্ঞান' — প্রণয় কুমার কুণ্ডু, অরুণ কুমার বসু সম্পাদিত সমতট পত্রিকা-১৩৮৮; বাংলাগদ্য ঃ রীতিগত অনুধাবন, পবিত্র সরকার, তদেব।

৫. Linguistics and literature : Prose and poetry; Hayes, Curtis W., 1969.

৬. The Language of fiction, David Lodge, 1966.

৭. উপন্যাসের ভাষা, অমিয়ভূষণ মজুমদার, বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা গ্রন্থে সংকলিত, ১৩৮৮।

৮. তদেব।

৯. তদেব।

১০. লিখনে কী ঘটে, অমিয়ভূষণ মজুমদার, জানুয়ারী, ১৯৯৭।

১১. তদেব ।